North South University Library

বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও গুণগত মানসম্পন্ন এবং মানহীন রয়েছে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও তা-ই। এক ধরনের প্রশস্ত ফাঁক রয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে। যোগ্য শিক্ষক-কারিকুলাম, এমনকি যোগ্য ছাত্র না থাকলে কখনো ভালো গ্র্যাজুয়েট বেরোবে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যকার এই গ্যাপ ঠিক করা না গেলে কখনোই সেরা প্রোডাক্ট পাওয়া যাবে না।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা ও উদ্ভাবনের সংস্কৃতি এখনো সীমিত। এটি বাড়াতে কী ধরনের নীতি বা উদ্যোগ দরকার?

–এটা না হওয়ার পেছনে দায়ী–এক. রাষ্ট্রীয় অসহযোগিতা, দুই. প্রাতিষ্ঠানিক ওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড গোল। এ দুই জায়গাতেই বিফল হয়েছে শিক্ষাব্যবস্থা। রাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে, কোন কোন ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সাপোর্ট দেবে। এটা যদি সবাইকে গড়পরতা দেয় তাহলে কিন্তু হবে না। কারণ গবেষণা এগোনোর জন্য সবচেয়ে বড় উপকরণ মানবসম্পদ। যার কাছে সেরা মানবসম্পদ আছে, কোনো বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানে তাকে ওই জায়গাতেই গবেষণায় ফান্ড দেওয়া উচিত। এ কাজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। তাদের মধ্যে সমন্বয় রাখতে হবে। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল হচ্ছে সায়েন্স ফ্যাকাল্টি। সেখানে বায়োলজি-কেমিস্ট্রি-ফিজিকসের যে রিসার্চগুলো হয় তার সঙ্গে ঢাকা মেডিক্যাল, বারডেম বা পিজি হাসপাতালের কোনো যোগাযোগ নেই। বাংলাদেশ গবেষণার জন্য এখনো ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে পারেনি।

ডিজিটাল প্রযুক্তি ও এআইয়ের যুগে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কিভাবে পরিবর্তিত হওয়া উচিত? এআই উন্মুক্ত, এখানে শিক্ষার্থীদের করণীয় কী?

–প্রযুক্তি কিন্তু তৈরি হয় ভালোর জন্য। তবে নেতিবাচক দিকও আছে। আমরা কখনোই বলব না যে এআই ইজ ব্যাড। কিন্তু এর বাজে প্রভাব যেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে না পড়ে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমরা বলি এআই বিষয়ে স্টেটমেন্ট তৈরি করতে–এআই দিয়ে কী করা যাবে বা যাবে না তা ঠিক করা খুবই জরুরি হয়ে গেছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য। এখানে প্রযুক্তি দিয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার ঠেকাতে হবে। বিশ্লেষণধর্মী অংশে এআইয়ের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। কারণ মানুষ ম্যানুয়ালি অনেক কিছু করতে পারে না; কিন্তু যন্ত্র অনেক কিছুই দ্রুত সময়ে পারে। এটি আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা। প্রযুক্তির অগ্রগতি সত্যিই গবেষকদের লাখ লাখ এবং কোটি কোটি তথ্য বিশ্লেষণ করে খুব দ্রুত ফলাফল দিতে বা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। কিন্তু সৃষ্টিশীল বিষয়ে এআই পরিত্যাজ্য। উদ্ভাবনী চিন্তা বা সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে চিন্তার যোগ্যতা দেখাতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনেক ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এআই ব্যবহার করা যেতে পারে অ্যানালিটিক্যাল পার্টে। এআই দিয়ে ক্রিয়েটিভ থিংকিং বা শিক্ষার্থীদের মেধাশক্তির বিচার সম্ভব নয়।

সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ারের পাশাপাশি সুনাগরিক বা ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ধরনের ভূমিকা থাকতে পারে?

–প্রত্যেকটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোটোর মধ্যে থাকা উচিত যে সে কি ধরনের গ্র্যাজুয়েট তৈরি করবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই থাকতে হবে এথিক্যাল, মোরাল এবং ইন্টিগ্রিটি ডিভোশন এবং সর্বোপরি প্রত্যেক গ্র্যাজুয়েট গুড হিউম্যান বিয়িং হবে। সভ্য সমাজ গড়ে না উঠলে একটা সভ্য রাষ্ট্র গড়ে উঠবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আদর্শিক জায়গায় থেকে ছাত্র-ছাত্রীর নৈতিক দিকটা বিবেচনা করতে হবে। তার মধ্যে থট লিডারশিপ আসবে।

শিক্ষায় নীতি-নির্ধারকদের জন্য আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ কী?

–নীতিনির্ধারক যাঁরা আছেন, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যদি আমি সার্বিকভাবে বলি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ এর অধীনে যতগুলো উইং আছে, হোক তা ইউজিসি, ঢাকা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ইত্যাদি, সবগুলোর মধ্যে এক ধরনের 'ফ্রি ফ্লো ইনফরমেশন ডেসিমিনেশন'র ব্যবস্থা থাকতে হবে। মন্ত্রণালয়কে সবসময় স্টেকহোল্ডার বডির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এটা করতে হবে। চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) আরো শক্তিশালী বা দায়িত্বশীল হতে কোনো সংস্কার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না?

–প্রতিবছর উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থী বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। তাদের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট করতে হবে। আমাদের কিন্তু শিক্ষার্থীর তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কম। সুতরাং তা বাড়াতে হবে। তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া একটা বিলম্বিত প্রক্রিয়া। এখানে পরিবর্তন আনা জরুরি।

বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য আপনার পরামর্শ কী?

–শুধু ক্লাসরুমে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তার ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। বর্তমান বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার অনেক বিস্তৃত। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলার কার্যক্রমে যুক্ত থাকতে হবে। এতে নেতৃত্বের দক্ষতা, দলগতভাবে কাজ করার ক্ষমতা এবং সামাজিক সচেতনতা তৈরি হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তাদের ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা। একজন গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে নৈতিকতা, সততা ও মানবিক মূল্যবোধ থাকা জরুরি। কারণ শেষ পর্যন্ত একটি সভ্য সমাজ গড়ে ওঠে ভালো মানুষের মাধ্যমে।

আপনি নামকরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। সেখানকার কোন বিষয়টা আপনাকে আক্ষেপে ফেলেছিল–এমন কোনো ঘটনা আছে কি?

–সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাকালীন আরো উচ্চশিক্ষার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা শহর আমেরিকার বোস্টনে পড়াশোনার সুযোগ পাই আমি। সেখানে পৃথিবীর আরো দশটা বড় বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছি আমার আশপাশে। দেখেছি, আমি নিজেই বাংলাদেশে শিক্ষক ছিলাম; কিন্তু একটা বঞ্চিত পিছিয়ে পড়া তরুণ-তরুণীর কথা খুব ভাবিনি যে সামাজিকভাবে পেছনে থাকা সেই মানুষটাকে কিভাবে এখানে আনা যায়? কিন্তু ওই দেশে এই ভাবনাটা আছে। আবার স্পেশাল চাইল্ডদের জন্য উন্নত দেশগুলোতে যে পরিমাণ শিক্ষার সুযোগ রেখেছে, তা আমাকে অভিভূত করেছে। আমি সেই জিনিসটা নর্থ সাউথে করার চেষ্টা করছি।

গেল বছর টাইমস হায়ার এডুকেশন ওয়ার্ল্ড অ্যাকাডেমিক সামিটে ছিলেন আপনি। সেখানে কি অ্যাকাডেমিশিয়ানদের মাঝে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের আদান-প্রদান হয়, তা বাস্তবায়নের চেষ্টা কি আপনারা করেন?

–আমার এই ৩৮ বছরের ক্যারিয়ারে, বিশেষ করে গত ২০ বছর আমার জীবনের সবচেয়ে ব্লেসড মেসেজ হচ্ছে যে পৃথিবীর প্রায় ৫০টা দেশের এক শর বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রিত অতিথি ছিলাম আমি। এই সুযোগ আমাকে উন্নত বিশ্বের নানা সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। এতে আমি অল্টারনেটিভ থিংকিংয়ের সুযোগ পেয়েছি। সেখানে শুধু র‍্যাংকিং নিয়ে নয়, বরং গুণগত মান-গবেষণা-জ্ঞান নিয়ে আলোচনা হয়। কিছুদিন আগে চায়নার টপ জিংওয়া ইউনিভার্সিটিতে গেছি। সেখানে জানলাম, তাদের ইউনিভার্সিটিতে মেডিক্যালে ভর্তির পদ্ধতি পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছে তারা। তারা বলছে, মেডিক্যালে পড়তে হলে আগে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাগবে। ভাবা যায়! এই ধারণার কথা যদি বাংলাদেশে বলি, তাহলে সবাই কী বলবে? আমি দেখলাম এটা খুবই যৌক্তিক এই অর্থে যে আজকের চিকিৎসাব্যবস্থা যন্ত্র-নির্ভর হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারদের এখন মেশিন ড্রিভেন ডিসিশন দিতে হয়। এমআরআই, সিটি স্ক্যান, এক্স-রে, ইকো এ সব রিপোর্টই যন্ত্র দিচ্ছে। একজন ডাক্তারের আবিষ্কৃত ওষুধের প্রয়োগ বা পরীক্ষার জন্য যে ধরনের যন্ত্র প্রয়োজন তা যদি তিনি নিজেই বানাতে পারেন, তবে সেটাই সর্বোচ্চ ফল বয়ে আনবে। কাজেই একজন প্রকৌশলীকে যখন ডাক্তারি পড়ানো হবে, তখন তিনি বুঝবেন তার বানানো মেশিনটাকে আরো কার্যকর বানাতে করণীয় কী। বাংলাদেশে চিকিৎসা শিক্ষাকে এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেওয়া হয়নি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বেশি মেডিক্যাল উইংস আছে, অথচ ওটা একটা লিবারেল আর্টস ইউনিভার্সিটি ছিল। এ কারণে সেখানকার গবেষণায় ঠিকই একটা ওষুধ আবিষ্কার হয়, চিকিৎসা যন্ত্র আবিষ্কার হয়। আমি বলি, সুযোগটা থাকতে হবে। আমাদের দেশে এসএসসি আর এইচএসসির রেজাল্ট খারাপ করলে সে বুয়েটে যেতে পারে না, অথবা ঢাকা মেডিক্যালে যেতে পারে না। তার মানে আমাদের সত্যিকারের সমস্যা আছে এই শিক্ষাব্যবস্থায়।